অনুবাদকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা মহান রব্বুল আলামিনের জন্য। পরিপূর্ণ রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক রাহমাতুল্লিল আলামিন, তাঁর পূত-পবিত্র পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের ওপর।

মানবজীবন সর্বদা সরল রেখার মত সমান্তরালে চলে না। স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই মানবজীবনে থাকে নানানরকম উত্থান-পতন আর চড়াই-উতরাই। শত বাধা-বিপত্তি আর প্রতিকূল পরিবেশের মধ্য দিয়েই একজন মানুষকে তার জীবন সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হয়। জীবনের যেকোনো পরিস্থিতিতে করণীয় এবং বর্জনীয় সম্পর্কে মৌলিক দিকনির্দেশনা আল-কুরআনুল কারিমে দেওয়া আছে।

সুরা আম্বিয়া কুরআনের ওইসব সুরার অন্যতম, যে সুরাগুলোতে জীবনের সব দিক নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই সূরায় ষোল জন নবীর আলোচনা এসেছে। ফলে সুরার নাম রাখা হয়েছে 'সুরা আম্বিয়া'।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মাদ রাবে হাসানি নদভি রহ. এর সংকলিত বয়ানের অনুবাদ। যেখানে তিনি ধারাবাহিকভাবে সুরা আম্বিয়ার ওপর বিভিন্ন মজলিসে আলোচনা করেছেন। আর তিনি আলোচনার ক্ষেত্রে ক্লাসিক্যাল তাফসিরের ধারা অনুসরণের পরিবর্তে সহজ-সরল ভঙ্গিমা, প্রাঞ্জল ভাষা এবং সর্বসাধারণের জন্য সহজবোধ্য আঙ্গিকে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন। তাফসির এবং ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান, সৌরজগৎ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এসেছে। তিনি এই জটিল শাস্ত্রীয় আলোচনাগুলোও অত্যন্ত পারঙ্গমতার সাথে সাবলীল ভাবে উপস্থাপন করেছেন। ফলে স্বাভাবিকভাবে শাস্ত্রীয় রস-কষহীন আলোচনার প্রতি যে এক ধরনের অনাগ্রহ এবং বিতৃষ্ণা কাজ করে, তা এখানে হয়নি। বরং তার অনন্য ভাষাশৈলী, উন্নত সাহিত্য রুচি এবং চমৎকার বর্ণনাভঙ্গির কারণে তা আকর্ষণীয় রূপে হাজির হয়েছে।

সুতরাং সম্পূর্ণ সুরা আম্বিয়ার সরল অনুবাদ, সাবলীলভাবে উপস্থাপিত কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা, জীবনের কঠিন বিপদাপদ ও দুঃসময়কে স্থিরচিত্তে এবং দৃঢ় মনোবলের সাথে মোকাবেলা করার নির্দেশিকা, চরম ডিপ্রেসড জীবন থেকে মুক্তি লাভের চাবিকাঠি, অসার কুফর-শিরিক আর অবিশ্বাসের কাঁচের প্রাসাদকে বলিষ্ঠ যুক্তি তর্ক এবং শক্তিশালী প্রমাণাদি দ্বারা ভেঙে চুরমার করা, নিজেকে তাওহিদ ও পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত করে চূড়ান্ত সফলতার জন্য প্রস্তুত করা, এসবের কোনো একটি অথবা সবকটি যদি আপনি চান; তাহলে এই বইটি আপনার জন্য। তাই পড়ুন, নিজেকে আলোড়িত করতে এবং আলোকিত করতে।

মহান রবের তৌফিকে দীর্ঘ সময় পরে হলেও অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। এজন্য তাঁর দরবারে কায়মনোবাক্যে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

কাজটি আমার প্রথম অনুবাদ হওয়ায় মাঝেমধ্যে কিছু ব্যাগ পেতে হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে প্রথমত মূল পাঠ থেকে প্রকৃত মর্ম ও ভাব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছি। অতঃপর সেই ভাব নিজ ভাষায় সাধ্য অনুযায়ী উত্তম ভাবে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি। রাবে হাসানি নদভি রা. এর মত সুসাহিত্যিকের কথাগুলো সাহিত্য মান অক্ষুন্ন রেখে অনুবাদ করা বেশ কঠিন কাজ। তবে এক্ষেত্রে আমার সাধ্য যতটুকু ছিল, তাতে কোন ত্রুটি হয়নি। বাকি কতটুকু সফল হয়েছি, তা বিচারের দায়িত্ব বিজ্ঞ পাঠক মহলের উপর থাকলো।

আমার মত একজন মানুষ থেকে এমন একটি কাজ উদ্ধার করার পূর্ণ ক্রেডিট "ইহদা পাবলিকেশনে"র কর্ণধার তরুণ কর্মোদ্যমী আলেম আশিক ভাইয়ের। এবং এই কাজে আরো যাদের থেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা পেয়েছি তাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা রইলো। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বন্ধুবর মুফতি মিনারুল ইসলাম ভাইয়ের প্রতি। তিনিই প্রথম এই কাজের দিকে আমাকে পথপ্রদর্শন করেছেন এবং উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পরিশেষে মহান রবের প্রতি এই মিনতি, তিনি যেন এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে একমাত্র তার উদ্দেশ্যেই কবুল করে নেন। সবার জন্য উপকারী করে দেন। আমাদেরকে সব ধরনের লৌকিকতাপূর্ণ আমল থেকে মুক্ত ও নিরাপদ রাখেন।

ইমাদুদ্দীন হামদুল্লাহ
জামিয়া আনোয়ারুল উলূম সালামবাগ
সালামবাগ, ১৫৯-পূর্ব রামপুরা, ঢাকা-১২১৯

সূচিপত্র

মানবপ্রকৃতির চাহিদা	১৩
স্বভাব ও অবস্থার বৈচিত্র	১৩
ইসলামের তাৎপর্য	১৪
বান্দা থেকে আল্লাহর চাওয়া	১৬
মানবপ্রকৃতি	১৭
ঐশী নেজাম	১৭
বিশ্বব্যবস্থা	১৮
নবি-রাসুল	১৯
নবিদের আত্মত্যাগ	২০
মুজিজার তাৎপর্য	২১
মূর্তিপূজার পূর্বে	২২
শিরকের সূচনা	২৪
মুশরিকদের অবস্থা	২৬
চূড়ান্ত অপছন্দনীয় বিষয়	২৭
শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি	২৮
ঐশী অনুগ্রহের দাবি	২৯
উম্মুল কিতাব-এর মর্মার্থ	৩১
আরবদের বৈশিষ্ট্য	৩২
আত্ম-জবাবদিহিতার প্রতি আহ্বান	৩৪
আল্লাহ তাআলার অসীম কুদরত	৩৫
জিন এবং মানুষের ক্ষমতা	৩৭
জমিনে প্রতিনিধি নিযুক্ত করার উদ্দেশ্য	৩৭
পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত	৩৮
কাফেরদের ঠাট্টা-উপহাস	৪০

মুশরিকদের মনের কিবলা	৪১
ঐশ্বরিক জ্ঞান	৪৩
অনুমাননির্ভর কথাবার্তা	৪৫
ঐশী বিধান	৪৬
নবিদের ধারাবাহিকতা	৪৭
নবিগণও মানুষ ছিলেন	৪৮
প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	৪৯
সর্বশেষ আসমানি কিতাব	৪৯
জুলুমের পরিণতি	৫১
আল্লাহ তাআলার পাকড়াও-এর ভয়	৫২
মানুষের অসহায়ত্ব	৫৩
আসমান-জমিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৫৪
হক বাতিলের পার্থক্য	৫৫
আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব	৫৬
মিথ্যা উপাস্য	৫৮
আল্লাহ তাআলার এককত্ব	৫৮
অজ্ঞতার বিপত্তি	৬০
জালেমদের পরিণতি	৬১
চিন্তাশীল হওয়ার প্রতি আহ্বান	৬৩
জ্যোতির্বিদ্যা ও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি	৬৩
পানির গুরুত্ব	৬৬
পাহাড় একটি নেয়ামত	৬৬
আকাশ একটি সংরক্ষিত ছাদ	৬৮
চন্দ্র ও সৌর জগত	৬৮
মানবীয় দুর্বলতা	৬৯
মৃত্যু জীবনের নিয়তি	৭০
রহমানের অস্বীকারকারী	৭২
মানবস্বভাব	৭৩
আজাবের বর্ণনা	৭৪
ঠাট্টা-উপহাসের পরিণতি	৭৫
আল্লাহ তাআলার সুরক্ষাব্যবস্থা	৭৬
কাল্পনিক দেবতাদের অবস্থা	৭৯

উদাসীনতার কারণ	৮০
মুশরিকদের দৃষ্টান্ত	৮২
আল্লাহ তাআলার ক্ষমতা	৮৩
ন্যায়ের পাল্লা	৮৪
ইতিহাসের জীবন্ত উদাহরণ	৮৫
নবির কথার গুরুত্ব	৮৬
কল্যাণময় বাণী	৮৭
নবিদের আলোচনা	৮৭
নবিদের দায়িত্ব	৮৮
মানুষের যোগ্যতার উৎস	৮৯
দুটি ঐশী ব্যবস্থা	৯০
অকৃতজ্ঞতার অর্থ	৯০
নবিদের প্রেরণ	৯১
নবিদের ঘটনার উদ্দেশ্য	৯২
বিভিন্ন ঘটনাবলির ইতিহাস	৯৪
মানবজীবনে উন্নতির সোপান	৯৬
উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনের উত্তম দৃষ্টান্ত	৯৭
হজরত ইবরাহিম আ.	৯৯
কুরআন মাজিদের আলংকারিক সৌন্দর্য	৯৯
জ্যোতিষশাস্ত্রীয় অনুসন্ধান	১০১
মূর্তিপূজার নানারূপ	১০২
অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী	১০৩
হজরত ইবরাহিম আ.-এর দাওয়াত	১০৪
পূর্ণাঙ্গ তাওহিদ	১০৫
দুঃসাহসিক পদক্ষেপ ও খোদায়ী মদদ	১০৬
তাওহিদের ওপর দৃঢ়তা	১০৭
ইবরাহিমী ঘোষণা	১০৯
ঐশ্বরিক সাহায্য	১১১
বস্তু বৈশিষ্ট্যের বাস্তবতা	১১৩
আল্লাহর কুদরত	১১৩
মুশরিক সম্প্রদায়ের চক্রান্ত	১১৪
হিজরতের নির্দেশ	১১৫
হজরত লুত আ.	১১৫

বরকতময় ভূমি	১১৬
ঐশী পুরস্কার	১১৬
একটি সম্ভ্রান্ত পরিবার	১১৭
ইবরাহিমী ঘটনার ম্যাসেজ	১১৭
পরবর্তী কথা	১১৯
হজরত নুহ আ.	১২১
নবির প্রার্থনার পর	১২২
হজরত দাউদ ও সুলাইমান আ.	১২৪
দাউদ আ.-এর আদালতে মোকদ্দমা	১২৫
সুলাইমান আ.-এর ফয়সালা	১২৫
জরুরি ব্যখ্যা	১২৬
আল্লাহপ্রদত্ত পুরস্কার	১২৭
বর্ম শিল্পের প্রশিক্ষণ	১২৮
সুলাইমানী সিংহাসন	১২৯
জিনদের ওপর শাসন	১২৯
হজরত আইয়ুব আ.	১৩০
ঐশী শক্তির বহিঃপ্রকাশ	১৩২
তিনজন ধৈর্যশীল নবি	১৩৩
হজরত ইউনুস আ.	১৩৪
হজরত ইউনুস আ.-এর সম্প্রদায়	১৩৬
চিন্তাশীল অনুভূতি শক্তি	১৩৭
হজরত জাকারিয়া আ.	১৩৭
হজরত মারইয়াম আ.	১৩৯
এক উম্মাহ	১৪০
পার্থক্যের মানদণ্ড	১৪১
চিন্তা-ফিকির ও আমলের প্রতি আহ্বান	১৪৩
বিশ্বব্যবস্থার উদাহরণ	১৪৪
মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে পার্থক্য	১৪৪
জান্নাতে প্রবেশের শর্ত	১৪৬
কার্যকারণ নিমিত্ত ফলাফলের ব্যখ্যা	১৪৭
আল্লাহর ন্যায়বিচার	১৪৮
নবিদের জীবন মানবতার আদর্শ	১৪৯
সাধনার পুরস্কার	১৫৩

শাস্তিপ্রাপ্ত জাতিসমূহ	১৫৪
মুত্তাকিদের অভ্যর্থনা	১৫৫
মুত্তাকিদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার	১৫৬
বিশ্বব্যবস্থাপনা ও আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি	১৫৮
বনি ইসরাইলের ঔদ্ধত্য	১৫৯
আল্লাহর অভিশাপ	১৬০
মানবপ্রকৃতির দুর্বলতা	১৬১
মীমাংসিত বিষয়	১৬২
মুত্তাকিদের জন্য বার্তা	১৬৩
দয়ার নবি	১৬৪
একক ও মহান খোদা	১৬৭

মানবপ্রকৃতির চাহিদা

স্বভাব ও অবস্থার বৈচিত্র

আল্লাহ তাআলা মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের প্রকৃতি খুব বৈচিত্রময়। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অবস্থা বিরাজ করে। স্বয়ং একজন ব্যক্তির মধ্যেই বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যে অবস্থাগুলো বিরাজ করে, তা-ও অনেক বৈচিত্রময় এবং অত্যন্ত গভীর। কখনো বিষয়গুলো একেবারে খোলামেলা এবং স্পষ্ট হয়। যেমন, 'রাগ-গোস্বা' মানুষের একটি প্রকাশ্য বৈশিষ্ট্য। রাগান্বিত হওয়ার কোনো বিষয় ঘটলে সে রেগে যায়। অনুরূপভাবে বেদনাদায়ক বিষয়ের সম্মুখীন হলে কষ্ট পাওয়া এবং দুঃখিত হওয়াও মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য। এসব তো মানুষের দৃশ্যমান এবং কমন বৈশিষ্ট্য। কিন্তু মানুষের সূক্ষ্ম ও সুপ্ত কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। এককথা শুনে মানুষের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, আরেককথা শুনে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। আবার কোনো কথা শুনে ভেতর থেকে এমন অনুভব করে যে, কথা তো ঠিকই বলছে, একদম সত্য; কিন্তু আমি এটা অস্বীকার করি কীভাবে!

মানুষের আরেকটি স্বভাব হলো, 'দম্ভ-অহংকার'। এই স্বভাবের কারণে ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি এমন হয় যে, সে মনে করে—আমার সমপর্যায়ের একজনের কথা কীভাবে মেনে নিই! তার কথা মেনে নিলে তো সে বড় প্রমানিত হয়ে যাবে, আমার মানহানি হবে, আমি ছোট হয়ে যাব!

অন্য কেউ বড় হয়ে যাবে, শুধু একারণেই অনেক সময় মানুষ অন্যের কথা মেনে নেয় না। আবার কখনো এজন্য কথা মানতে চায় না যে, বিষয়টি তার মস্তিষ্কে ভালোভাবে বসে না অথবা মনের সাথে বোঝাপড়া হয় না। তথাপি, বিবেক-বুদ্ধি আর মনের জগত আলাদা হয়ে থাকে। বিবেক কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে চলে। আর মনের স্বভাব হচ্ছে, তা কোনো কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে চলে না। তার মূল ভিত্তি হচ্ছে আভ্যন্তরিক এক অনুভূতির ওপর। কারো এই আবেগ-অনুভূতি বুদ্ধি-বিবেকের সম্পূর্ণ বিপরীতে যায়। অর্থাৎ ব্যক্তি বুঝতে পারছে যে, এতে ক্ষতি

আছে, এরপরও তার মন সেটাই চাচ্ছে। নিশ্চিতভাবে ক্ষতি জানা সত্ত্বেও মন মানে না। আবার এমনও হয় যে, মন চাচ্ছে না, অথচ এতে উপকার আছে। তখন ব্যক্তি কেবল মন না চাওয়ার কারণেই বিষয়টি থেকে বিরত থাকে।

ইসলামের তাৎপর্য

ইসলামের অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা-খুশির ওপর সমর্পন করা। তার এমন অবস্থা হবে যে, আল্লাহ তাআলা যা চান আমিও তা-ই চাই। আমি তো এক ভৃত্যের চেয়ে নগণ্য। গোলামকে তো শুধু তার মনিব ক্রয় করেছে। কিন্তু মানুষ এবং প্রাণী-জগতকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি জিনিসই তাঁর সৃষ্টি করা এবং প্রত্যেকেই তাঁর অধীন। যেমন, মানুষ যখন কোনো একটা জিনিস বানায়, তখন সেটার ব্যাপারে তার পূর্ণ এখতেয়ার থাকে। সে চাইলে ভেঙ্গে ফেলতে পারে, আবার চাইলে রেখে দিতে পারে। এতে কেউ তাকে কোনোরকম জবাবদিহি করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা যা চান, তা বাস্তবায়নে তাঁর পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তিনি মানুষকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। জীবনযুদ্ধে সফলতা লাভের সহায়ক সবধরনের গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য তাকে দিয়েছেন। যাতে সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এবং সুন্দর জীবন গঠন করতে পারে। এরপর তিনি মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়েছেন। বিবেক হিসাব করে চলে, আর মন শুধু খেয়াল-খুশি মতো চলে। এই সবকিছু দেওয়ার পর আল্লাহ তাআলা চান, অন্তত তোমরা কৃতজ্ঞ হও। এসব নেয়ামত তো আমিই তোমাদেরকে দান করেছি। তোমাদেরকে সব ধরনের উপায়-উপকরণ দিয়েছি। খাদ্যদ্রব্য কি তোমরা নিজেরাই সৃষ্টি করেছ? না। লক্ষ করলে বোঝা যায়, আমাদের কোনো জিনিসই আমাদের সৃষ্টি করা না। আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি না; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এমনই। আপনি যেকোনো একটি জিনিস নিয়ে তার ইতিবৃত্তান্ত দেখেন, ফলাফল এটিই বেরিয়ে আসবে যে, সবই আল্লাহ তাআলার দান আর অনুগ্রহ।

উদাহরণস্বরুপ: আপনি যে কাপড়টি পরিধান করে আছেন, আপনি বলছেন, 'এটি আমার কাপড়, আমি সেলাই করে বানিয়েছি।' কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে, এটি আপনার হলো কীভাবে? আপনি নিজেই কি এটি তৈরি করেছেন? না, বরং প্রথমে একজন সুতা বানিয়েছে। আর যে সুতা বানিয়েছে, সে কোন জিনিস দিয়ে সুতা বানিয়েছে? নিশ্চয় সে আল্লাহ তাআলার দেওয়া কোনো জিনিস থেকেই সুতা বানিয়েছে! অতঃপর সেই সুতা দিয়ে অন্য একজন কাপড় বানিয়েছে। এরপর

আরেকজন কাপড়টি বাজারে পৌঁছে দিয়েছে। অতঃপর বাজারে সেই কাপড়ের ক্রেতা ছিল আরেকজন। পরিশেষে কাপড়টি আপনি ক্রয় করে দর্জিকে দিয়েছেন, সে জামা বানিয়েছে। তখন আপনি এই জামাটি পেয়েছেন। কাজেই এর সাথে জড়িত কোনো একজনের প্রচেষ্টাকে যদি বাদ দিন, তাহলে হয়ত জামা বানানো হতো না—সুতা তৈরি করা হতো না, কাপড় বাজারে পৌঁছানো হতো না অথবা দর্জির সেলাই করা হতো না। মোটকথা, কোনো একটি জিনিস বাদ দিলে আপনি জামাটি পেতেন না। কিন্তু আপনি মনে করছেন, 'জামা আমার, আমি পেয়েছি!' অথচ এতে দশ বারোজনের ভূমিকা রয়েছে। এসবকিছুর পরে গিয়ে আপনি জামা পেয়েছেন। যদি এদের কোনো একজনের ভূমিকা বাদ দেওয়া হতো, তাহলে আপনার জামা পাওয়া সম্ভব ছিল না।

এভাবেই আমাদের ব্যবহার্য যেকোনো জিনিস—যেগুলো থেকে আমরা উপকৃত হই, তা নিয়ে চিন্তা করুন। তাহলে এই বিষয়টিই উপলব্ধি হবে যে, এই সবকিছুই আমরা অন্যদের সহযোগিতায় পেয়েছি। প্রকৃত পক্ষে অন্যদের সহযোগিতাও মূখ্য না। কারণ মৌলিক উপদান-উপকরণগুলো যদি না থাকত, তাহলে কোনোকিছুই বানানো যেত না। জগৎ সংসারের সবকিছু এই নিয়মের অধিনেই চলছে। আল্লাহ তাআলা এই বিশ্বচরাচরে আমাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিস রেখে দিয়েছেন। যেসবের সাহায্যে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র তৈরি করতে পারি। যেসব আসবাবপত্র দিয়ে আমাদের জীবনের প্রয়োজন পূরণ হয়, সেসব জিনিসের মৌলিক উপাদান-উপকরণ আল্লাহ তাআলাই প্রস্তুত করে দিয়েছেন। আর সেগুলোকেই জোড়া-তালি দিয়ে আমরা প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। অতএব, প্রতিটি দানা, প্রতিটি অনু-পরমাণু আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহেই পেয়েছি। এজন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, আমরা যেন অন্তত এই বিষয়টি মেনে নিয়ে স্বীকৃতি দিই যে, আমাদের ওপরও আল্লাহ তাআলার অপরিসীম দয়া আর অনুগ্রহ রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া যে, তিনি আমাদেরকে এসব জিনিস দান করেছেন। অন্যথায় আমরা কোথায় পেতাম! আজকাল প্রতিটি জিনিসের ক্ষেত্রেই যে 'আমার আমার' বলি, এখান থেকেই মূলত সংঘাত সৃষ্টি হয়। আমাদের অবস্থা এমন হয়েছে যে, আমরা যদি কোনো ব্যক্তির অনুগ্রহের স্বীকৃতি দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাতে যাই, তাহলে এতটাই অতিরঞ্জন করি যে, আল্লাহ তাআলাকেই গৌণ করে দিই, আর ওই ব্যক্তিকেই আসল মনে করতে থাকি। যে বিষয়টি শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সৃজনক্ষমতার অধীন, আমরা মনে করি তা অন্য কেউ করে দিতে পারে! প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই শিরকের সূচনা হয়। অন্য কাউকে আমরা আল্লাহ তাআলার অংশিদার বানিয়ে দিই। আর তাকেই গৌণ করে ফেলি, যার

থেকে সবকিছু পেয়েছি এবং সবকিছু তারই অনুগ্রহ। তিনি যদি কোনো একটা কিছুকে সরিয়ে নেন, তাহলেই সব শেষ হয়ে যায়।

উদাহরণ স্বরূপ: আল্লাহ তাআলা যদি সূর্যের উষ্ণতাকে বাড়িয়ে দেন, তাহলে সব চাষাবাদ ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ সবকিছু যে স্বাভাবিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে চলছে, তখন তা আর থাকবে না। যত মানুষ জীবিত আছে, সবাই বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক অবস্থার ওপর নির্ভর করেই চলছে। সূর্যের যতটুকু উষ্ণতা আমাদের প্রয়োজন, আল্লাহ তাআলা তাতে ততটুকু উষ্ণতা রেখেছেন এবং সূর্যকে এতটুকু দূরত্বে রেখেছেন, যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা উষ্ণতা পাই। যদি এই তাপ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়, তাহলেই বিপত্তি। আবার যদি কমে যায়, তাহলেও সমস্যা। বাতাসের বিষয়টিও অনুরূপ। যদি বাতাস একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সমস্যা। আবার যদি বেশি জোরে প্রবাহিত হয়, তাহলেও সমস্যা। মোটকথা, আল্লাহ তাআলা নিখিল ব্যবস্থাপনায় এক অনন্য ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। যে ভারসাম্য দিয়ে সবকিছুকে পূর্ণতা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা যদি এর মধ্যে সামান্য পরিমাণ গড়বড় করে দেন, তাহলেই মানুষ অসহায়। কিছুই করতে পারে না। একইভাবে সমস্ত ঔষধ এবং উপায়-উপকরণও আল্লাহ তাআলার কুদরত এবং তাঁর আদেশের অধীনে।

বান্দা থেকে আল্লাহর চাওয়া

আল্লাহ তাআলা মানুষকে বলেন, আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি। সুতরাং তোমরা অন্তত এটা স্বীকার করো যে, সকল জিনিস আমিই তোমাদেরকে দান করেছি এবং এসব জিনিসের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য রেখেছি তা-ও তোমাদের জীবন এবং স্বাস্থ্যের জন্য রেখেছি। সুতরাং এই বাস্তবতাকে স্বীকার করো, অনুধাবন করো! ঔষধপত্রের কার্যকারিতা কোত্থেকে এলো? ঔষধের কার্যকারী ক্ষমতা এবং গুণাগুণ যদি আল্লাহ তাআলা তাতে না দিতেন, তখন তো তোমরা কিছুই করতে পারতে না। যেমন, এক উদ্ভিদ আমরা খাদ্যদ্রব্য হিসেবে ব্যবহার করি, আবার তা ঔষধেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেটি ঔষধে কেন ব্যবহৃত হয়? কারণ আল্লাহ তাআলা তাতে ঔষধী গুণাগুণ রেখেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি সর্বদা সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছি এবং সবকিছু আমার তত্ত্বাবধানেই হচ্ছে। সুতরাং ছোটখাটো একেবারে নগণ্য বিষয়গুলোও তাঁর কথাতেই সংঘটিত হয়। তাই যখন আল্লাহ তাআলার নির্দেশেই হয়, তখন সেই ঔষধ কাজ করে। আর যদি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ না হয়, তাহলে তা কাজ করে না।

মানবপ্রকৃতি

আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে স্বভাব প্রকৃতি দান করেছেন, তা-ই হলো মানবপ্রকৃতি। ভালোকে পছন্দ করার এবং মন্দকে অপছন্দ করার এক অনুভূতি তার মধ্যে আছে। এজন্যই হাদিসে বলা হয়েছে, গুনাহ হচ্ছে ওই বিষয় যা তোমার অন্তরে খটকা লাগে।' (হাদিস আছে,) মানুষের বিবেক ও অন্তর ভালো বিষয়কে ভালো এবং খারাপ বিষয়কে খারাপ মনে করে। কিন্তু এরপরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যায় যে, বোঝার পরও সে মন্দ কাজে লিপ্ত হয় কীভাবে? এর উত্তর হচ্ছে—মন্দ কাজে লিপ্ত হওয়ার একটি বড় কারণ হলো, তার কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওইসকল জিনিস, যেগুলো দৈহিকভাবে আরাম দায়ক; যেগুলোর মাধ্যমে ক্ষণিকের জন্য মানুষ ভালো লাগা এবং আনন্দ অনুভব করে। এর কারণে কেউ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে নাকি কোনো অনৈতিক কিছু হচ্ছে, এ ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে তা-ই করতে থাকে। যেমন, কেউ শুধু শখ পূরণ করার জন্য অন্যের হক মেরে দেয়। তবে এই বিষয়টি স্বতঃসিদ্ধ যে, মানুষ যে খারাপ কাজই করুক, সে বুঝে এটা খারাপ। এমনকি তার বিবেকও অনুভব করে যে, বিষয়টি মন্দ।

ঐশী নেজাম

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু মহান আল্লাহ তাআলা এক ব্যবস্থা চালু করে দিয়েছেন। যখন মানুষের প্রবৃত্তিপূজার কারণে খারাপ কাজ সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন তাদেরকে বোঝানোর জন্য একদল লোকের আগমণ হয়। তারা মানুষকে বলে, তোমরা ভুল করছ। মন্দ কাজ করছ। এভাবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক জোড়ে দেয়। তারা লোকদেরকে আরও বলে, ভালো-মন্দ আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। মানুষের স্বভাব প্রকৃতিও আল্লাহ তাআলারই সৃষ্টি। আর তার মাঝে ভালো-মন্দ পার্থক্য করার যোগ্যতাও রেখেছেন। আবার তাকে এমন এক প্রবৃত্তি দিয়েছেন, যার নানান রং বেরঙের কামনা-বাসনা আছে।

সুতরাং প্রকৃত সফল ব্যক্তি সে, যে ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে পারে। আর এই দুনিয়া হচ্ছে মানুষের জন্য পরীক্ষার হল। এখানে মানুষকে পাঠানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে, তাকে পরীক্ষা করা। দেখা হবে, কে প্রবৃত্তিপূজায় লিপ্ত হয়, আর কে তার প্রকৃত মালিকের বিধান মেনে চলে। নিজের কামনা বাসনাকে বিসর্জন দিয়ে সঠিক পথে চলে, নাকি অন্যকিছু করে। অতএব, সে যদি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহলে তার পরিণাম হবে জাহান্নাম। আর যদি সে নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে, তাহলে পুরস্কার স্বরূপ সে জান্নাতে চিরসুখে থাকবে। আল্লাহ তাআলার বাণী—

فَأَمَّا مَنْ طَغٰى . وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا . فَإِنَّ الْجَحِيْمَ هِيَ الْمَأْوٰى . وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى . فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى .

> অনন্তর, যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, নিশ্চিতভাবে জাহান্নামই তার আবাস। পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, নিশ্চিতভাবে জান্নাতই তার ঠিকানা।[১]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করেছে এটা অনুধাবন করে যে, আল্লাহ তাআলা পুণ্যকে পছন্দ করেন, আর পাপকে অপছন্দ করেন এবং তিনি পাপ-পুণ্যকে সৃষ্টি করেছেন এটা দেখার জন্য যে, কে পুণ্যের পথ অনুসরণ করে, আর কে পাপের পথ অনুসরণ করে।

বিশ্বব্যবস্থা

মহাবিশ্বে যা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, সবই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। এই মহাজগতের সমুদয় ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তাআলার অনুগত এবং তাঁর হুকুমেই পরিচালিত। এখানে প্রতিটি জিনিস তা-ই করে আল্লাহ তাআলা তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃজন করেছেন। শুধু মানুষ আর জিন এর ব্যতিক্রম। কারণ এই দুই শ্রেণীকে এখতেয়ার দেওয়া হয়েছে; জগতের অন্যকিছুকে এই এখতেয়ার দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা এসব জিনিসকে যে প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃজন করেছেন, সেই অবস্থা এবং প্রকৃতি তাদের স্বভাবজাত হয়ে যায়। এর বাইরে তারা কিছু করতে পারে না। যেমন, আল্লাহ তাআলা গাছ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু সে নিজ ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না। বরং আল্লাহ তাআলা তার জন্য যে পথ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে

১. সুরা নাযিআত, ৩৭-৪১

দিয়েছেন, সেই পদ্ধতিতেই গাছ হবে। প্রথমে বীজ থেকে চারা হবে। এরপরে যদি তাতে পানি দেওয়া হয়, যত্ন নেওয়া হয়, তাহলে ধীরে ধীরে তা একটি পূর্ণ বৃক্ষে পরিণত হবে। কিন্তু এখানে নিজ ইচ্ছায় কি সে কিছু করতে পারে? যেমন, এক প্রজাতির ফলের গাছ নিজের ইচ্ছায় কি অন্য আরেক প্রজাতির ফলগাছে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারবে? অথবা সে নিজের জায়গা পরিবর্তন করতে পারবে? এটা অসম্ভব। কারণ তার এই এখতেয়ার নেই।

একইভাবে, জগতের কোনো কিছুরই নিজস্ব কোনো এখতেয়ার নেই। আল্লাহ তাআলা যে উদ্দেশ্যে যেভাবে সৃজন করেছেন, তারা ঠিক সেভাবেই কাজ করে। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকুলের মাঝে শুধু মানুষ আর জিনকেই এক নির্দিষ্ট গণ্ডি পর্যন্ত এই এখতেয়ার দিয়েছেন। তাদেরকে যাচাই করার জন্যে যে, তারা নিজ ইচ্ছায় আল্লাহ তাআলার কতটুকু আনুগত্য করে। তবে আল্লাহ তাআলা চাইলে তাদেরকে আনুগত্যে বাধ্য করতে পারতেন। তাদেরকে এমন স্বভাব প্রকৃতি দিয়ে দিতেন, যার ফলে তারা আনুগত্যের বাইরে যেতেই পারত না। যেমন, ফেরেশতারা আনুগত্য ছাড়া কিছু করতেই পারে না। আল্লাহ তাআলা যা চান ফেরেশতারা তা-ই করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষ এবং জিনকে এই এখতেয়ার দিয়েছেন যে, তার মন না চাইলে সে বিরোধিতা করতে পারে।

নবি-রাসুল

আল্লাহ তাআলার নিয়ম হচ্ছে, যখন প্রবৃত্তিপূজার কারণে মানুষের মাঝে মন্দ বিষয়গুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই সংশোধনকারী প্রেরণ করেন। পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যে যারা সংশোধনের কাজ করতেন, সাধারণত তাদেরকে নবি বলা হতো। পরিভাষায় তাদের জন্য নবি ও রাসুল দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়। নবি বলা হয়, যিনি ভবিষ্যতের কথা বলেন, ভবিষ্যদ্বানী করেন। আর রাসুল বলা হয়, যিনি স্বীয় রব আল্লাহর পক্ষ থেকে বিধান নিয়ে আসেন। এজন্য কুরআনের যেখানে রাসুল শব্দ উল্লেখ করা হয়, সেখানে উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ তাআলার বিধান আনয়নকারী। আর যেখানে নবি বলা হয়, সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি পরকাল সম্পর্কে সংবাদদাতা।

কুরআন-হাদিস অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায় যে, রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হওয়ার আগে পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যে অনেক নবি-রাসুলের আগমন হতো। তারা সংশোধনের কাজ করতেন। ফেরেশতা মারফত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের নিকট ওহি আসত। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছে নবুওয়াতের পরিসমাপ্তি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সর্বশেষ নবি বানিয়েছেন। তিনি এটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, তাঁর পরে আর কোনো নবি আসবেন না। তবে তিনি যে কাজ করতেন, উম্মত সেই কাজ করতে থাকবে। আর যারা এই কাজ করবে, তাদেরকে দায়ি, মুবাল্লিগ ও মুসলিহ বলা হবে। আল্লাহ তাআলা তাদের মাধ্যমে ওই কাজ আঞ্জাম দেবেন, পূর্ববর্তী জাতিদের মধ্যে যে কাজ নবিদের মাধ্যমে আঞ্জাম দিতেন।

নবিদের আত্মত্যাগ

নবিদের জীবনী পাঠে জানা যায়—অনেক সময় এমন হয়েছে যে, কোনো সম্প্রদায়ে নবি এসে পুরো জীবন দাওয়াতি কাজে ব্যয় করেছেন, তবুও সেই সম্প্রদায়ের মাঝে কোনো পরিবর্তন আসেনি; তারা নবির কথা গ্রহণ করেনি। পরিশেষে আল্লাহ তাআলার নিকট নবি আবেদন করেছেন যে—'সাধ্যমত আমরা সব ধরনের চেষ্টা-প্রচেষ্টা করেছি, কিন্তু এরা একেবারে পাথরের মতো! নিজেদের বদঅভ্যাস পরিবর্তনে তারা একদমই প্রস্তুত না। সঠিক পথ অবলম্বনেও তারা আগ্রহী না। সুতরাং তাদের এখন দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। পৃথিবীর বুক থেকে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই ভালো।' ফলে নবির দুআর কারণে আল্লাহ তাআলা ওইসব লোকদেরকে আজাব দিয়ে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

অতঃপর এক নতুন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছে। ওই সম্প্রদায় থেকেই কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তখন ওই অল্পসংখ্যক লোকের সন্তানসন্ততির মাঝেই আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়েছেন। ফলে অল্প সময়ে মধ্যেই নতুন করে এক সম্প্রদায় প্রস্তুত হয়ে গেছে। কুরআন মাজিদে নবিদের তালিকায় নুহ আ.-এর নাম বিশেষভাবে এসেছে। তার বয়স হয়েছিল এক হাজার বছর। সাড়ে নয়শত বছর তিনি দাওয়াত ও তাবলিগ করেন। মানুষকে মন্দ কাজকর্ম থেকে বারণ করেছেন। পরিশেষে তিনি একেবারে নিরাশ হয়ে আল্লাহর নিকট আবেদন করেছেন—'হে পরওয়ারদেগার, এখন এদেরকে ধ্বংস করে দাও। তারা সব মন্দ লোক। এই ধরণিতে তাদের উপস্থিতি কেবল বিপর্যয়ের কারণ হবে। তারা এখন আর পৃথিবীতে বসবাসের উপযুক্ত না।' ফলে আল্লাহ তাআলা মহা-প্লাবনে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।